হজ্জ তারবিয়াহ

সিরিজ-২



হজ্জের ঐতিহাসিক পটভূমি ও ইবরাহীম (আ:)

এ সেশনে যা অন্তর্ভুক্ত থাকছেঃ

- ইবরাহীম (আঃ) এর পরিচিতি ও সময়
- আবুল আম্বিয়া ও সাইয়েদুল আম্বিয়া
- হযরত ইবরাহীম (আ:) এর নবুযয়ত প্রাপ্তি
- ইবরাহীম (আঃ) ও পিতা আযর
- দ্বীনের দাওয়াত
- নমরুদকে দাওয়াত
- হযরত ইবরাহীম (আ:) এর হিজরত
- বিবি হাজেরা
- হযরত ইবরাহীম (আ:) এর ৩টি কৌশলের ব্যাখ্যা
- হযরত ইসমাইলের (আ:) জন্ম
- হযরত হাজেরা ও ইসমাইল (আ:) নির্বাসনে
- জমজম কূপের সৃষ্টি
- হযরত ইসমাইল (আ:)-এর কুরবানী
- কাবাগৃহ তৈরী

হজ্জ তারবিয়াহ সিরিজ
আলোচ্য বিষয়সমূহ

১. হজ্জের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং ইহরাম
২. হজ্জের ঐতিহাসিক পটভূমি ও ইবরাহীম (আ:)
৩. আরাফা, মোজদালিফা ও মিনায় অবস্থান এবং হাজীদের করণীয়
৪. জামারাত (পাথর মারা), কুরবানী করা ও মাথা মুন্ডনের বিধান
৫. হজ্জে মাবরুর এবং হজ্জ পরবর্তী করণীয়
৬. মৌলিক বিশ্বাসঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাগুতকে অস্বীকার, কুফর ও ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি
৭. তাওহীদের ধারণা এবং প্রচলিত শিরক ও বিদাআ'ত সমূহ
৮. কবীরা গুনাহ ও তওবার গুরুত্ব
৯. তাহারাতঃ ওযু, গোসল ও তায়াম্মুম
১০. রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সালাত
১১. স্বনির্ভর জাতি গঠনে যাকাত ও উশরঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
১২. ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা
১৩. সুদ নিষিদ্ধকরণঃ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ
১৪. রাসূল (সঃ) এর মাক্কী জীবন
১৫. রাসূল (সঃ) এর মাদানী জীবন
১৬. সাহাবীদের জীবন থেকে
১৭. ইসলামের পারিবারিক জীবন ও সন্তান প্রতিপালন
১৮. পর্দার ইসলামী বিধান ও পোশাক
১৯. ইসলামে সামাজিক জীবনের সৌন্দর্য: আমানতদারিতা, সত্যবাদিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, কোমলতা ও ত্যাগ

হজ্জের ঐতিহাসিক পটভূমি ও ইবরাহীম (আ:)

ইবরাহীম (আঃ) এর পরিচিতি ও সময়

ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন নূহ (আঃ) এর ১১তম অধঃস্তন পুরুষ। নূহ (আঃ) থেকে ইবরাহিম (আঃ) পযর্ন্ত প্রায় ২০০০ বছরের ব্যবধান ছিল। হযরত সালেহর (আঃ) প্রায় ২০০ বছর পরে ইবরাহিম (আঃ) আগমন ঘটে। ইবরাহিম (আঃ) ছিলেন,'আবুল আম্বিয়া' বা নবীগণের পিতা এবং তার স্ত্রী 'সারা' ছিলেন নবীদের মাতা। তার স্ত্রী সারার পুত্র ইসহাক (আঃ) পুত্র ইয়াকুব (আঃ) এর বংশধর 'বনী ইসরাইল' নামে পরিচিত। অপর স্ত্রী হাজেরার পুত্র ইসমাইল (আঃ) এর বংশে জন্ম নেন, বিশ্ব ও শেষ নবী মোহাম্মদ (সঃ)। শেষ নবীর উম্মৎরাই 'উম্মতে মোহাম্মদী' বা মুসলিম উম্মাহ নামে পরিচিত।

আবুল আম্বিয়া ও সাইয়েদুল আম্বিয়া

ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন ইহুদী-খৃষ্টান-মুসলিম সব সম্প্রদায়ের পিতা। কেননা আদম(আঃ) থেকে ইবরাহিম (আঃ) পর্যন্ত ১০/১২ জন নবী ছাড়া, শেষ নবী মোহাম্মাদ (সঃ) পর্যন্ত ১ লাখ ২৪ হাজার নবীদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন, ইবরাহীম (আঃ) এর বংশধর।

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

"আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীমের বংশধর ও 'ইমরানের বংশধরদেরকে সমগ্র বিশ্ববাসীর ওপর প্রাধান্য দিয়ে (তাঁর রিসালতের জন্য) মনোনীত করেছিলেন৷ " (সূরা আলে ইমরান-৩৩)

বিশ্বে মহান আল্লাহর তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য ও আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য মহান আল্লাহর এই নির্বাচন ছিল। ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন নবীগণের পিতা এবং পুত্র মোহাম্মাদ ছিলেন, নবীগণের নেতা। এই বিষয়টাই আমরা সালাতের দুরুদে প্রতিদিন পড়ি। ইবরাহীমের (আঃ) বরকত হল নবুয়ত/ ঐশী কিতাবের বরকত। মুহাম্মদ (স) এর বরকত হল বিজ্ঞানময় কুরআন/হাদীসের বরকত।

হযরত ইবরাহীম (আ:) এর নবুযয়ত প্রাপ্তি

ইবরাহীম (আঃ) ইরাকের বসরার নিকটবর্তী 'বাবেল' শহরে জন্মগ্রহন করেন। এখানে তখন ক্যালেডিয় জাতি বাস করত। তাদের সম্রাট ছিলে নমরুদ। নমরুদ প্রায় ৪০০ বছর রাজত্ব করে। সূরা আম্বিয়া (৫২-৫৬) সে সময়ের কথা স্মরণ করো ! যখন সে তার নিজের বাপকে ও জাতিকে বলেছিল, "এ মূর্তিগুলো কেমন, যেগুলোর প্রতি তোমরা ভক্তিতে গদগদ হচ্ছো?" আয়াত নাস্বার ৫৩: তারা জবাব দিলঃ আমাদের বাপ-দাদাদেরকে আমরা এদের ইবাদাতরত অবস্থায় পেয়েছি৷ "

আয়াত নাস্বার ৫৪: সে বললো, তোমরাও পথভ্রষ্ট এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যেই অবস্থান করছিল৷ " আয়াত নাস্বার ৫৫: তারা বললো, তুমি কি আমাদের সামনে তোমার প্রকৃত মনের কথা বলছো, না নিছক কৌতুক করছো? আয়াত নাস্বার ৫৬:

সে জবাব দিল, না, বরং আসলে তোমাদের রব তিনিই যিনি পৃথিবী ও আকাশের রব এবং এদের স্রষ্টা। এর স্বপক্ষে আমি তোমাদের সামনে সাক্ষ্য দিচ্ছি।

হযরত ইবরাহিম (আ:) দেখলেন তার জাতি মূর্তি, নক্ষত্র পূজা ইত্যাদিতে ব্যস্ত। তাদের কাছে আল্লাহর একত্ববাদ, মহত্ত্ব ও কুদরত ইত্যাদি অকল্পনীয়। এ ধরনের পরিস্থিতে হযরত ইবরাহিম (আ:) আল্লাহর উপর ভরসা করে সাহসের সাথে তাদের সামনে সত্যের দাওয়াত উপস্থিত করলেন। কিন্তু তারা দাওয়াত নিয়ে উপহাস করল ও আরো বেশী করে অবাধ্যতা করতে লাগলো। কিন্তু জাতি তার কথায় কর্নপাত করল না।

‘হে আমার জাতি! এ আমি কি দেখছি? তোমরা নিজ হাতে তৈরী করা মূর্তির পূজা করছো। তোমরা কি এমনই অজ্ঞতার নিদ্রায় বিভোর রয়েছ যে, নিষ্প্রান কাঠকে নিজেদের যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাটার পর মূর্তি তৈরী করছো। যদি সেটা সঠিক তোমাদের চাহিদা অনুযায়ী না হয় তাহলে সেটা ভেংগে আবার তৈরী করছো। তৈরীর পর আবার তাকে পূজা করছো।

ইবরাহীম (আঃ) ও পিতা আযর

হযরত ইব্রাহিম(আ:) দেখলেন শিরকের সবচেয়ে বড় উপাদান তার নিজের বাসায়। পিতা আযর মূর্তি তৈরী আর তা বাজারে বিক্রি করতো। কাজেই হযরত ইব্রাহিম (আ:) চিন্তা করলেন তার বাসা

থেকেই সত্যের প্রচার শুরু করতে হবে। তিনি তার পিতাকে বললেন, মূর্তি -পূজা করা শিরক। এক আল্লাহর ইবাদত করুন। নিজের হাতে তৈরী করা করা মূর্তি আপনার কোন লাভ-ক্ষতি করতে পারবে না। দুনিয়া/আখেরাতের সফলতা পেতে হলে, আপনাকে অবশ্যই এক আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। এতে পিতা আযরের কোন ভাল প্রতিক্রিয়া হোল না। বরং তিনি হযরত ইব্রাহিমকে ধমকাতে লাগলেন।

তিনি হযরত ইব্রাহিমকে (আ:) বলেন, তুমি যদি এই মূর্তিগুলোর নিন্দা করতে থাক, তাহলে আমি তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করবো। হযরত ইব্রাহিম (আ:) দেখলেন ব্যাপার সীমা অতিক্রম করেছে। এদিকে পিতার সম্মান রক্ষা করার প্রশ্ন অন্যদিকে আল্লাহর কর্তব্য পালন। তিনি পিতার কঠোর জবাবের উত্তর শান্ত/নরমভাবে দিলেন। পিতা, যদি আমার কথার উত্তর এটা হয়, তাহলে আজ হতে আপনাকে সালাম করে আমি পৃথক হয়ে যাচ্ছি। কারণ কোন অবস্থাতেই আমি মূর্তির পূজা করতে পারবোনা। তবে আপনার অগোচরে আপনার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব।

সূরা-মারইয়াম-(৪১-৪৮), আর এই কিতাবে ইবরাহীমের কথা বর্ণনা করো৷ নিঃসন্দেহে তিনি একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষ এবং একজন নবী ছিলেন (আয়াত-৪১)।(এদেরকে সেই সময়ের কথা একটু স্মরণ করিয়ে দাও) যখন সে নিজের বাপকে বললো,

“আব্বাজান! আপনি কেন এমন জিনিসের ইবাদত করেন, যা শোনেও না দেখেও না এবং আপনার কোন কাজও করতে পারে না? (আয়াত-৪২)।আব্বাজান! আমার কাছে এমন এক জ্ঞান এসেছে যা আপনার কাছে আসেনি, আপনি আমার অনুসরণ করে চলুন, আমি আপনাকে সোজাপথ দেখিয়ে দেবো (আয়াত-৪৩)। আব্বাজান!আপনি শয়তানের বন্দেগী করবেন না। শয়তান তো করুণাময়ের অবাধ্য (আয়াত-৪৪)। আব্বাজান! আমার ভয় হয় আপনি করুণাময়ের আযাবের শিকার হন কি না এবং শয়তানের সাথী হয়ে যান কি না” (আয়াত-৪৫)।

বাপ বললো, “ইবরাহীম! তুমি কি আমার মাবুদদের থেকে বিমুখ হয়েছো? যদি তুমি বিরত না হও তাহলে আমি পাথরের আঘাতে তোমাকে শেষ করে দেবো; ব্যস তুমি চিরদিনের জন্য আমার থেকে আলাদা হয়ে যাও” (আয়াত-৪৬)। আয়াত ইবরাহীম বললো, “আপনাকে সালাম। আমি আমার রবের কাছে আপনাকে মাফ করে দেবার জন্য দোয়া করবো (আয়াত-৪৭)। আমার রব আমার প্রতি বড়ই মেহেরবান। আমি আপনাদেরকে ত্যাগ করছি এবং আপনারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকেন তাদেরকেও, আমি তো আমার রবকেই ডাকবো। আশা করি আমি নিজের রবকে ডেকে ব্যর্থ হবো না” (আয়াত-৪৮) ।

দ্বীনের দাওয়াত

হযরত নূহ (আঃ) পিতা থেকে আলাদা হয়ে গেলেন এবং সমস্ত জাতিকে তার দাওয়াতের লক্ষ্যস্থলে পরিনত করলেন। কিন্তু জাতি কোনক্রমেই মূর্তিপূজা ছাড়ল না। হযরত ইব্রাহিম (আ:) তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, মূর্তিগুলো তোমাদের কোন লাভ/ক্ষতি করতে পারে কিনা ? তারা উত্তর দিল, আমরা তোমার সাথে কোন ধরনের তর্কে জড়িত হতে চাইনা।আমাদের পূর্ব-পুরুষরা এটা করেছে কাজেই আমরা এটা করছি। হযরত ইব্রাহিম (আ:) তাদের উত্তর দিলেন, তোমাদের মূর্তিগুলোকে আমার কোন ক্ষতি করতে বল। নবী পিতা আযরকে ও জাতির সামনে যা তুলে ধরলেন, সেটা সুরা শুয়ারায় বিস্তারিত বলা আছে।

শুয়ারা-(৬৯-৭৯):আর তাদেরকে ইবরাহীমের কাহিনী শুনিয়ে দাও (আয়াত-৬৯),যখন সে তার বাপ ও তার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করেছিল, "তোমরা কিসের পূজা করো? (আয়াত-৭০)" তারা বললো, "আমরা কতিপয় মূর্তির পূজা করি এবং তাদের সেবায় আমরা নিমগ্ন থাকি৷ (আয়াত-৭১)"সে জিজ্ঞেস করলো, "তোমরা যখন তাদেরকে ডাকো তখন কি তারা তোমাদের কথা শোনে? (আয়াত-৭২)।অথবা তোমাদের কি কিছু উপকার বা ক্ষতি করে? (আয়াত-৭৩)" তারা জবাব দিল, "না, বরং আমরা নিজেদের বাপ-দাদাকে এমনটিই করতে দেখেছি৷ (আয়াত-৭৪)" এ কথা ইবরাহীম বললো, "কখনো কি তোমরা (চোখ মেলে) (আয়াত-৭৫),

সেই জিনিসগুলো দেখেছো যাদের বন্দেগী তোমরা এবং তোমাদের অতীত পূর্বপুরুষেরা করতে অভ্যস্ত? (আয়াত-৭৬),এরা তো সবাই আমার দুশমন একমাত্র রাব্বুল আলামীন ছাড়া, (আয়াত-৭৭),যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন,তারপর তিনিই আমাকে পথ দেখিয়েছেন (আয়াত-৭৮)। তিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান (আয়াত-৭৯)।

হযরত ইবরাহীম (আ:) এর জাতি মূর্তিপূজার সাথে নক্ষত্রেরও পূজা করতো। তারা মনে করতো, মানুষের জন্ম-মৃত্যু, লাভ-ক্ষতি, রিযিক,দূর্ভিক্ষ ইত্যাদি সবকিছুই এই সমস্ত নক্ষত্রের প্রভাবে হচ্ছে। কাজের তাদের সন্তুষ্ট রাখা উচিৎ। নবী তখন ঐ সমস্ত মানুষের বুঝার উপযোগী বিচিত্র পদ্ধতির আশ্রয় নিলেন।
রাত ছিল নক্ষত্রপূর্ণ উজ্জল। হযরত ইবরাহীম (আ:) নক্ষত্রের দিকে দেখে বললেন, এটা কি আমাদের খোদা ? কারণ এই নক্ষত্রটা বেশ উজ্জল ও প্রচুর আলো দেয়। খোদা হবার শক্তি এই নক্ষত্রেরই আছে। সকাল হয়ে আসলে, নক্ষত্রের আলো ম্লান হয়ে আসলো। অন্য শক্তির প্রভাবে যে চলে যায় কিংবা পরিবেশের প্রভাবে এভাবে যে এতদ্রুত বদলায় সে কখনো খোদা হতে পারেনা। সেই তুলনায় মানুষ অনেক বেশী স্তিথিশীল। এভাবে চাদ, সূর্য্য প্রতিটার ব্যাপারেই একই ভাবে তিনি প্রশ্ন তুললেন। সমস্ত শক্তি-যুক্তি যখন শেষ হয়ে গেল, তখন তারা নবীকে তাদের উপাস্য শক্তিগুলোর ভয় দেখাতে লাগলো যে, তাদের দেবতা অবশ্যই এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করবে।

নবী তাদের বলেন, তোমাদের এই শক্তিগুলো আমার কোন ক্ষতিই করতে পারবেনা। কাজেই এক আল্লাহর ইবাদৎ কর আর শিরক ছেড়ে দাও। আল্লাহ বলেন, সূরা-আনআম-(৭৫-৮৩), ইবরাহীমকে এভাবেই আমি যমীন ও আসমানের রাজ্য পরিচালন ব্যবস্থা দেখাতাম৷ আর এ জন্য দেখাতাম যে, এভাবে সে দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে (আয়াত-৭৫)। অতঃপর যখন রাত তাকে আচ্ছন্ন করলো তখন একটি নক্ষত্র দেখে সে বললোঃ এ আমার রব। কিন্তু যখন তা ডুবে গেলো, সে বললোঃ যারা ডুবে যায় আমি তো তাদের ভক্ত নই (আয়াত-৭৬)।

তারপর যখন চাঁদকে আলো বিকীরণ করতে দেখলো, বললোঃ এ আমার রব৷ কিন্তু যখন তাও ডুবে গেলো তখন বললোঃ আমার রব যদি আমাকে পথ না দেখাতেন তাহলে আমি পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম (আয়াত-৭৭)। এরপর যখন সূর্যকে দীপ্তিমান দেখলো তখন বললোঃ এ আমার রব, এটি সবচেয়ে বড় !
কিন্তু তাও যখন ডুবে গেলো তখন ইবরাহীম চীৎকার করে বলে উঠলোঃ হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করো তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই (আয়াত-৭৮)।

আমি তো একনিষ্ঠভাবে নিজের মুখ সেই সত্তার দিকে ফিরিয়ে নিয়েছি যিনি যমীন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং আমি কখনো

মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই (আয়াত-৭৯)। তার সম্প্রদায় তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো। তাতে সে তার সম্প্রদায়কে বললোঃ তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমার সাথে বিতর্ক করছো ? অথচ তিনি আমাকে সত্য সরল পথ দেখিয়ে দিয়েছেন এবং তোমরা যাদেরকে তাঁর সাথে শরীক করছো তাদেরকে আমি ভয় করি না, তবে আমার রব যদি কিছু চান তাহলে অবশ্যি তা হতে পারে। আমার রবের জ্ঞান সকল জিনিসের ওপর পরিব্যাপ্ত। এরপরও কি তোমাদের চেতনার উদয় হবে না? (আয়াত-৮০)।

আর তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করেছো তাদেরকে আমি কেমন করে ভয় করবো যখন তোমরা এমন সব জিনিসকে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে শরীক করতে ভয় করো না যাদের জন্য তিনি তোমাদের কাছে কোন সনদ অবতীর্ণ করেন নি? আমাদের এ দুদলের মধ্যে কে বেশী নিরাপত্তালাভের অধিকারী ? বলো, যদি তোমরা কিছু জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকো (আয়াত-৮১)। আসলে তো নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা তাদেরই জন্য এবং সত্য সরল পথে তারাই পরিচালিত যারা ঈমান এনেছে এবং যারা নিজেদের ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশিয়ে ফেলেনি (আয়াত-৮২)। ইবরাহীমকে তার জাতির মোকাবিলায় আমি এ যুক্তি প্রমাণ প্রদান করেছিলাম। আমি যাকে চাই উন্নত মর্যাদা দান করি। প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, তোমার রব প্রজ্ঞাময় ও জ্ঞানী (আয়াত-৮৩)।

নমরুদকে দাওয়াত

ধীরে ধীরে হযরত ইব্রাহিমের কথা রাজ-দরবার পর্যন্ত পৌছে। তখন ইরাকের রাজাদের উপাধি ছিল নমরুদ। রাজারা শুধুই রাজাই ছিল না, তারা নিজেদের খোদা, মালিক বলে দাবী করতো। নমরুদ চিন্তা করলো, যদি ইবরাহীম (আ:) এর দাওয়াত এভাবে চলতে থাকে, তাহলে রাজত্ব শেষ হয়ে যাবে। কাজেই নমরুদ ইবরাহীম (আ:)কে হাজির করার জন্য বলেন। নমরুদ নবীকে প্রশ্ন করলেন, কেন তুমি পূর্ব-পুরুষদের ধর্মের বিরোধিতা আর আমাকে খোদা মানতে অস্বীকার করছো।

নবী বলেন, আমি এক আল্লাহর ইবাদৎ করি। তার সাথে কাউকে শরিক করিনা। সমস্ত বিশ্ব-জগৎ তার সৃষ্টি করা। তিনি সকলের স্রষ্টা ও মালিক। আমি ও তুমি তার সৃষ্টি করা একজন মানুষ। তুমি মূর্তির পূজা কর। তুমি কিভাবে খোদা হতে পার?

নমরুদ বললো, তোমার খোদার এমন গুণ বর্ণনা কর যেটা আমার মধ্যে নাই ? নবী বলেন, আমার মহান আল্লাহ জীবন –মৃত্যুর মালিক। নমরুদ জীবন-মৃত্যুর মালিক একথা প্রমান করার জন্য রাজ-দরবারে একজনকে হত্যা করলো। একজন মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত মানুষকে তার দন্ড মাফ করে দিয়ে বললো জীবন-মৃত্যু নমরুদের হাতে। নবী বলেন মহান আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ঘোরান। তুমি এটাকে বিপরীতমুখী কর? একথায় নমরুদ হতবাক

ও নিরুত্তর হয়ে পড়ল। কারণ নমরুদ কখনও একথা বলেনি, যে সে সমস্ত বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা। তবে আর কাউকে বিশ্বের স্রষ্টা বলে সে বলতোনা। বরং সে বলতো চন্দ্র-সূর্য্য, নক্ষত্র ইত্যাদি আলাদা দেবতা। নমরুদ নিজেকে শুধু মানুষের দেবতা বলে দাবী করতো। নবীই প্রথম তাদের সামনে আল্লাহই বিশ্ব-জগতের নিয়ন্তা বলে সত্য তুলে ধরেছিলেন।

নমরুদ অপমানে রাগান্বিত হয়ে উঠলো। যদিও তাদের কোন যুক্তি ছিলনা। সাধারন প্রজা থেকে নমরুদ পর্যন্ত সবাই দেবতাদের অপমান করা ও পূর্ব-পুরুষদের ধর্মের বিরোধিতা করার জন্য নবীকে আগুনে জালিয়া দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। কারণ অপরাধীর এটাই শাস্তি।

আগুন ঠান্ডা হলো

সবচেয়ে দু:খের বিষয় আপন পিতা নবীর শত্রু। এছাড়া নমরুদ, সাধারন প্রজা, রাজকর্মচারী সমস্ত দেশ তার বিরুদ্ধে। কিন্তু নবী একটুও ভয় পেলেন না। বরং বেপরোয়া ভাবেই আল্লাহর সত্য প্রচার করতে লাগলেন। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তার কোন সাহায্যকারী ছিলনা।

একটা নির্দিষ্ট স্থান বাছাইয়ের পর নমরুদ সেই জায়গায় কয়েকদিন থেকে আগুন জ্বালাতে লাগলেন। তীব্র তাপে পাশের জায়গা, গাছপালা পর্যন্ত পুড়ে যাচ্ছিল। এখান ফেলে দিলে ইবরাহিম (আ:)

একেবারে ছাই হয়ে যাবে, নিশ্চিৎ হবার পর নমরুদ নবীকে আগুনে ফেলে দিলেন। মহান আল্লাহ আগুনকে নবীর জন্য ঠান্ডা হয়ে যেতে বলেন। আগুনের কুন্ড থেকে নবী বের হয়ে আসলেন।

হযরত ইব্রাহিমের (আ:) হিজরত

একমাত্র স্ত্রী সারা ও ভাতিজা লুত ছাড়া কেউ হযরত (আ:)-এর দাওয়াত গ্রহণ করেনি। আপন পিতাও এই সত্য গ্রহণ করেনি। নবী অন্যত্র গিয়ে আল্লাহর বানী প্রচারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। পিতা আযর ও তার জাতি থেকে পৃথক হয়ে ফোরাত নদীর পশ্চিম তীরের নিকটবর্তী এক জনপদে চলে গেলেন। এই জায়গার অধিবাসীরা কালদানী নামে পরিচিত ছিল। এখানে তিনি কিছুদিন ছিলেন। স্ত্রী সারা ও ভাতিজা লুত তার সাথে ছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি খারান/হারানের দিকে যাত্রা করলেন। সেখানে গিয়ে দীন প্রচার আরম্ভ করলেন। কিন্তু এখানেও তিনি পিতা আজরের জন্য সব সময় আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেন।

অবশেষে এখানে আল্লাহ ইব্রাহিমকে (আ:) জানিয়ে দেন যে, আযর ঈমান আনবে না। অত:পর তিনি পিতা আযরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। পিতার জন্য মাগফেরাত একটা ওয়াদা ছিল। আল্লাহর সিদ্ধান্তের পর তিনি সেটা থেকে সরে আসেন। ধর্ম প্রচার করতে করতে নবী ফিলিস্তিনে গিয়ে পৌছেন। সারা ও ভাতিজা লুত এখানেও তার সাথে ছিলেন। নবী ফিলিস্তীনের পশ্চিমে বসতি

করলেন। এটা কেনানীদের অধীনে ছিল। কিছুদিন পরে নবী শাকীমে(নাবলেসে) চলে যান। এবং ক্রমাগত পশ্চিমে অগ্রসর হতে থাকেন। অবশেষে মিসরে উপস্থিত হন।

বিবি হাজেরা

'সিফরুল ঈশা' নামক ইহুদী ধর্মগ্রন্থে আছে, হযরত ইবরাহীমের (আ:) সময় মিসরের বাদশাহ ছিল নবীর স্বদেশী লোক। ধারনা করা হয়, হযরত হাজেরা মিসরের রাজার কন্যা ছিলেন। তিনি দাসী ছিলেন না। তাওরাতের আন্যত্র আছে, সারা নিজেকে রক্ষার জন্য যখন, কেরামতি দেখাল, তখন মিসরের রাজা বলল, আমার কন্য সারার ঘরে বাদী হয়ে থাকা ভাল। অন্য ঘরে রানী হয়ে যাবার চেয়ে। এ কারনেই তিনি হাজেরাকে সারার সাথে দিয়ে দেন। হাজেরা শব্দ এসেছে হিব্রু হ্যাগার থেকে যার অর্থ বেগানা ও অপরিচিত।

হযরত ইব্রাহিমের(আ:) ৩টি কৌশলের ব্যাখ্যা

আবু হুরায়রা(রাঃ) বলেন, 'ইবরাহীম(আঃ) ৩টি ব্যতীত কোন মিথ্যা বলেননি'। প্রথম ২ টা কুরআনেই আছে। তৃতীয়টা হাদিসে আছে। আসলে তিনি একটাও মিথ্যা বলেননি। এগুলো ছিল অর্থবোধক পরিভাষা।

১) মেলায় না যাবার অজুহাত হিসাবে তিনি বলেছিলেন, 'আমি অসুস্থ' (সূরা আস-সাফফাত-৮৯)। তিনি নিজেকে অসুস্থ বলেছেন।

কিন্তু পীড়িত বলেননি। আসলে জাতির শিরক/কুফরী কাজ দেখে তিনি বিরক্ত বা বিতৃষ্ণ হয়ে গিয়েছিলেন।

২) মূর্তি ভেংগেছে কে ? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'বরং এই বড় মূর্তিটাই এই কাজ করেছে (আল-আম্বিয়া-৬৩)। তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন, মূর্তির দেবার বা কোন কিছুর করার ক্ষমতা নাই।

৩) মিসরের লম্পট রাজার হাত থেকে বাচার জন্য তিনি 'স্ত্রী সারাকে' বোন হিসাবে পরিচয় দেন। (সহীহ বুখারী-৩৩৫৮) নবীদের কাহিনী' অধ্যায়। অবশ্যই দুইজন দ্বীনি ভাই-বোন।

স্ত্রীর ইজ্জত বা নিজের রক্ষার জন্য এতটুকু বলা, মিথ্যার মধ্যে পড়ে না। তবুও হাদীসে এটা মিথ্যা হিসাবে আসার কারণ, মহান নবী/রাসূলগণের সামান্যতম ভুলকেও বড় করে দেখেন। যেমন আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া ভুলক্রমে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খান। মহান আল্লাহ এটাকে অবাধ্যতা/পথভ্রষ্টতা বলেন। অথচ ভুলক্রমে কৃত অপরাধ ক্ষমাযোগ্য। মওলানা মওদুদীসহ (রাসায়েল মাসায়েল) কিছু মোফাসসির এই ঘটনাকে রাবী আবু হুরায়রার (রাঃ) ভুল বা জাল হাদীস বলতে চেয়েছেন। বাইবেলের কোন ভার্সানে বিবি সারার বয়স তখন ৭৫ বা ৯০ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মওলানা মওদুদী এই বয়সকে যুক্তি ধরে, উক্ত ঘটনাকে মিথ্যা বলতে চেয়েছেন।

হযরত ইসমাইলের (আ:) জন্ম

হযরত ইবরাহীম (আ:) প্রথম দিকে নি:সন্তান ছিলেন। তার বাসগৃহের মালিক ছিল এক বাদীর গর্ভজাত গোলাম আল-ইয়ারায দেমাশকী। একদিন হযরত ইবরাহীম(আ:) আল্লাহর কাছে একটি সন্তানের জন্য দোয়া করলেন। তাওরাতে আছে, 'হে, আল্লাহ আমিতো নি:সন্তান। আমার বাদীর গর্ভজাত গোলাম আমার উত্তরাধিকারী হবে। আল্লাহ নবীকে এই বলে আশ্বস্ত করলেন, তোমার ঔরসজাত সন্তানই তোমার উত্তরাধিকারী হবে। বিবি হাজেরা গর্ভবতী হলেন। হযরত সারা এটা জানতে পেরে, মানবসুলভ দূর্বলতার কারনে বিবি হাজেরার প্রতি ঈর্ষান্বিত হলেন। বাধ্য হয়ে বিবি হাজেরা বিবি সারার কাছ থেকে চলে গেলেন।

হযরত হাজেরা ও ইসমাইল(আ:) নির্বাসনে

হাজেরার গর্ভে হযরত ইসমাইলের জন্ম হলে হযরত হাজেরা মনে খুবই কষ্ট পেলেন। হযরত সারা আগে থেকেই গৃহকত্রী ছিলেন। হাজেরা তার খেদমত করত। হযরত সারা ইব্রাহিমকে বললেন, হাজেরা আর তার শিশুপুত্র যেন তার সামনে না থাকে। তাদের অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দাও। এই কথা হযরত ইব্রাহিমের কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয় হল। কিন্তু আল্লাহ নবীকে হযরত সারার কথা মেনে নিতে বলেন।

হযরত ইবরাহীম (আ:), বিবি হাজেরা আর ইসমাইলকে নিয়ে বহুদূরে বর্তমান কাবাগৃহের স্থানে ও জমজম কূপের বর্তমান স্থানে একটা গাছের নীচে তাদেরকে রাখলেন। এটি ছিল অনাবাদী, জনবানব শূন্য, পানিবিহীন একটা জায়গা। প্রাণ বাঁচানোর জন্য অত্যন্ত কষ্টকর একটা জায়গা। হযরত ইব্রাহিম সামান্য পানি ও খেজুর বিবি হাজেরার পাশে রেখে, হযরত সারার কাছে চলে আসার জন্য রওনা দিলেন। বিবি হাজেরা তাঁর পিছনে আসতে আসতে বলতে লাগলেন, হে ইব্রাহিম (আ:) তুমি আমাদের এই কঠিন স্থানে রেখে কোথায় চললেন? কিন্তু ইব্রাহিম(আ:) নীরবে চলে যাচ্ছিলেন। অবশেষে বিবি হাজেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি আল্লাহর আদেশ? ইব্রাহিম(আ:) সম্মতি দিলেন। বিবি হাজেরা বলেন, এটা যদি উনার আদেশ হয়ে থাকে, তাহলে তিনি আমাদের ধ্বংস করবেন না। বিবি হাজেরা ফিরে আসলেন। কিছুদূর আসার পর হযরত ইব্রাহিম(আ:) আল্লাহর কাছে দুয়া করলেন।

رَبَّنَآ اِنِّیۡۤ اَسۡکَنۡتُ مِنۡ ذُرِّیَّتِیۡ بِوَادٍ غَیۡرِ ذِیۡ زَرۡعٍ عِنۡدَ بَیۡتِکَ الۡمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِیُقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ فَاجۡعَلۡ اَفۡئِدَۃً مِّنَ النَّاسِ تَہۡوِیۡۤ اِلَیۡہِمۡ وَارۡزُقۡہُمۡ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّہُمۡ یَشۡکُرُوۡنَ

"হে আমাদের রব! আমি একটি তৃণ পানিহীন উপত্যকায় নিজের বংশধরদের একটি অংশকে তোমার পবিত্র গৃহের কাছে এনে বসবাস করিয়েছি। পরওয়ারদিগার! এটা আমি এ জন্য করেছি যে,

এরা এখানে নামায কায়েম করবে। কাজেই তুমি লোকদের মনকে এদের প্রতি আকৃষ্ট করো এবং ফলাদি দিয়ে এদের আহারের ব্যবস্থা করো, হয়তো এরা শোকরগুজার হবে। " (সূরা ইবরাহীম-৩৭)

জমজম কূপের সৃষ্টি

বিবি হাজেরার খেজুর ও পানি দুটোই শেষ হয়ে গেল। বিবি হাজেরা ও ইসমাইল (আ:) দুজনেই পিপাসার্ত, ক্ষুধার্ত ও চিন্তিত ছিলেন। একবার তিনি শিশু ইসমাইলের(আ:) কাছে বসেন আবার 'সাফা' পাহাড়ের উপর গিয়ে বসেন যদি কোন পথিককে দেখতে পান। হয়ত: তাদের কাছে কিছু খাবার, পানি পেলে শিশু ইসমাইলের (আ:) জীবন বাঁচবে।এভাবে তিনি ৭ বার যাওয়া-আসা করলেন। হযরত মুহাম্মদ (স:) সেই স্থানে পৌছে বলেন, এটাই সেই 'সাফা-মারওয়ার দৌড়ানোর জায়গা', যেখানে হজ্জের সময় হাজীরা পালন করে থাকে। সর্বশেষ বারে যখন বিবি হাজেরা মারওয়ায় উঠলেন, তখন একটা আওয়াজ ভেসে আসল।

বিবি হাজেরা হযরত জিবরাইল (আ)কে পেলেন। ফেরেস্তা নিজের পায়ের গোড়ালী দিয়ে বর্তমান জমজম কূপের স্থানে আঘাত করছে। সাথে সাথে হযরত ইসমাইল (আ:) এর দাঁড়ানো স্থান থেকে পানি বের হওয়া শুরু হল। হযরত হাজেরা পানি ধরে রাখার জন্য বাঁধ দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু পানি অনবরত বের হতেই থাকল। আল্লাহ পাক 'হযরত ইসমাইলের (আ:) মাতার উপর রহম করুন। যদি তিনি বাঁধ না দিতেন, তাহলে সেটা মহাশক্তিশালী প্রস্রবনে

পরিনত হয়ে যেত। হযরত হাজেরা পানি নিজে পান করলেন ও ইসমাইলকে(আ:) পান করালেন। অত:পর ইসমাইলকে(আ:) দুধ পান করালেন।

ফেরেস্তা হযরত হাজেরাকে বললো, ভয় ও চিন্তা করোনা। আল্লাহ তোমাকে আর ইসমাইলকে (আঃ) ধ্বংস করবেনা। এটা বাইতুল্লাহ শরীফের জায়গা। বাইতুল্লাহ শরিফ নির্মানের দায়িত্ব এই শিশু ও তার পিতা হযরত ইবরাহীম (আ:) উপর দেয়া হয়েছে।

সে সময় বনি জোরহামের একটি গোত্র সেই উপত্যকার কাছে এসে থামল। তারা কাছেই পাখী উড়তে দেখে অনুমান করলো, কাছেই কোন জায়গায় পানি আছে। সেই গোত্র হযরত বিবি হাজেরার কাছে সে স্থানে বাস করার অনুমতি চাইল। পানির মালিকানা শুধুমাত্র হযরত হাজেরার থাকবে, এই শর্তে তারা সেখানে বাস করার অনুমতি পেল। পরবর্তীতে জোরহামীরা তাদের গোত্রের অন্য সদস্যদেরও সেখানে বাস করার জন্য ডেকে আনলো।

হযরত ইসমাইল (আ:) সেই পরিবেশে বড় হতে থাকলেন ও জোরহামীদের থেকে তাদের ভাষা শিখতে লাগলেন। বড় হলে হযরত ইসমাইলের চালচলন তাদের খুব পছন্দ হল ও তারা তাদের বংশের এক মেয়ের সাথে হযরত ইসমাইলের (আ:) বিয়ে দিলেন। তার কিছুদিন পরেই হযরত হাজেরা ইন্তেকাল করলেন।

চৌকাঠ পাল্টানোর নির্দেশনা

হযরত ইব্রাহিম (আ:) সবসময় তার পরিবারকে দেখার জন্য এখানে আসতেন। একবার তিনি এখানে আসলে, হযরত ইসমাইল(আ:) ঘরে ছিলেন না।

ছেলের স্ত্রীকে হযরত ইসমাইল (আ:) কোথায় গেছে, জিজ্ঞাসা করলে, তার স্ত্রী জবাব দেয়, জীবিকার জন্য বাহিরে গেছে। তোমাদের দিন কিভাবে চলছে ? তার স্ত্রী বললো, অত্যন্ত বিপদ ও দুখের মধ্য দিয়ে আমাদের সময় যাচ্ছে। হযরত ইসমাইল(আ:) আসলে তাকে আমার সালাম দিবে আর বলবে দরজার চৌকাঠ বদলাতে হবে। হযরত ইসমাইল(আ:) ঘরে ফিরে, হযরত ইব্রাহিমের(আ:) নূরে ও নব্যুয়তের অস্তিত্ব টের পেয়ে, স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন কেউ এসেছিল কিনা। হযরত ইসমাইলকে(আ:) উনার স্ত্রী সমস্ত ঘটনা জানালে, তিনি জানালেন উনি ছিলেন আমার পিতা হযরত ইব্রাহিম(আ:)। তিনি চান আমি যেন তোমাকে তালাক প্রদান করি।

তারপর হযরত ইসমাইল দ্বিতীয় বিয়ে করলেন্। একদিন হযরত ইব্রাহিম(আ:) পুনরায় ইসমাইলের(আ:) ঘরে এসে একই ধরনের প্রশ্ন করলে, তার স্ত্রী জানান, আমাদের দিন ভাল চলছে। হযরত ইসমাইল(আ:) এলে তাকে জানাবে চৌকাঠ ঠিক আছে। হযরত ইসমাইল(আ:) তাঁর স্ত্রীকে জানালেন, তিনি আমার পিতা ও তিনি

চান তুমি যেন সারা জীবন আমার স্ত্রী হয়ে থাক। হযরত ইব্রাহিম(আ:) তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দুয়া করলেন।

হযরত ইব্রাহিমের(আ:) বয়স যখন ৯৯ বছর হল তখন হযরত ইসমাইলের (আ:) বয়স হল ১৩ বছর। আল্লাহর পক্ষ থেকে খতনা করার নির্দেশ আসলে, হযরত ইব্রাহিম (আ:) প্রথমে নিজের ও পরবর্তীতে হযরত ইসমাইল(আ:) সহ পরিবারে সবার ও গোলামদের খতনা করালেন।

হযরত ইসমাইলের (আ:)-এর কুরবানী

হযরত ইব্রাহিম (আ:) একাধারে ৩ রাত স্বপ্নে দেখলেন, আল্লাহ বলছেন, তুমি আমার রাস্তায় তোমার একমাত্র পুত্রকে কুরবানী কর। তিনি হযরত ইসমাইলকে(আ:) স্বপ্নের কথা ও আল্লাহর নির্দেশ বর্ননা করলেন।পুত্রের সম্মতি পেয়ে কাজ শেষ করার জন্য দু'জনেই গভীর জংগলের দিকে অগ্রসর হলেন। পিতা পুত্রের সম্মতি পেয়ে জবেহ করার জন্তুর মত পুত্রের হাত-পা বেধে, ছেলেকে কুরবানী করার জন্য উদ্যত হলেন। সাথে সাথে ওহী আসলো "হে ইব্রাহিম!তুমি নিজের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করে দেখায়েছ। নি:সন্দেহে এটা বড় কঠিন পরীক্ষা ছিল। হযরত ইব্রাহিম (আ:) আল্লাহর শোকর আদায় করে, দুম্বা কুরবানী করলেন। সফফাত- ১১৩ 'হে আমার পালন কর্তা, আমি বরকত প্রদান করলাম তার উপর এবং ইসহাকের উপর'।

কাবাগৃহ তৈরী

হযরত ইব্রাহিম ফিলিস্তীনে থাকলেও ইসমাইল(আ:),হাজেরাকে দেখার জন্য মক্কায় আসতেন। এই সময়েই মহান আল্লাহ হযরত ইব্রাহিম (আ:)কে কাবা নির্মান করার জন্য আদেশ করলেন। হযরত ইব্রাহি (আ:), হযরত ইসমাইলের (আ:) এর সাথে আলোচনা করে, বাইতুল্লাহর তৈরীর কাজ শুরু করে দিলেন।

কাবাগৃহ তৈরীর সময় সমস্ত বিশ্বে মূর্তিপূজা ও নক্ষত্রপূজা মন্দিরগুলোতে চালু ছিল। এই সমস্ত মূর্তি/নক্ষত্রের নামে বিশাল বিশাল প্রাসাদ তৈরী করা হত। মিসরবাসীরা সূর্য, ইযদারীস, ইজিয়াস, হুরিয়াস, বাআল ইত্যাদি দেবতার পূজা করতো আর এই দেবতাদের নামে মন্দির ছিল। এদের মূর্তি, প্রতিকৃতি এই সমস্ত মন্দিরগুলোতে বিদ্যমান ছিল। মূর্তিগুলো বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান পদার্থ ও উপকরণ যেমন স্বর্ণ, রুপা, বিভিন্ন ধরনের দামী পাথর ইত্যাদির তৈরী ছিল।

কেনানী সম্প্রদায় বাআলের বিখ্যাত মন্দির তৈরী করেছিল। গাররাহ অধিবাসীরা ‘দাজুন’ নামের মৎস্য-দেবীর পূজা/বলী করত। আমুনী জাতি সূর্য্য-চন্দ্রের পূজা করত। পারসিকরা আগুনের পূজা করত। রোমানরা হযরত ঈসা (আ:) ও বিবি মারিয়মের মূর্তি গীর্জায় রেখে পূজা করত। হিন্দুরা বুদ্ধদেব, রাম, মহাদেবকে অবতার মনে করে কালী, শীতলা, সীতা, পার্বতী নামে হাজার মূর্তির পূজার জন্য বড়

বড় মন্দির, হারদুয়ার, প্রয়াগ, কাশী, পুরী, টেকশালা, সাচী, বুদ্ধগয়ার মত ধর্মীয় স্থানসমূহ তৈরী করে রেখেছিল।

পৃথিবীর সমস্ত মূর্তি-পূজার বিপরীতে, আল্লাহর একত্ববাদকে সমুন্নত করে রাখার জন্য সর্বপ্রথম আল্লাহর ঘর হল 'বাইতুল্লাহ শরীফ'। পিতা-পুত্র সবসময় কাবার নির্মান কাজে ব্যস্ত। গাথতে গাথতে দেয়াল যখন উপরে উঠে গেল, একখন্ড পাথরকে ভারা স্বরুপ করা হল। হযরত ইসমাইল(আ:) তাকে নিজ হাতে ধরে রাখতেন এবং হযরত ইব্রাহিম(আ:) তার উপর আরোহন করে গেথে যেতেন। বর্তমানে 'হাজরে আসওয়াদ' যেখানে আছে, ততটুকু হবার পর হযরত জিবরাঈল(আ:), হযরত ইব্রাহিমকে (আ:) কে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন ও নিকটস্থ পাহাড় থেকে 'হাজরে আসওয়াদ' (বেহেস্ত থেকে আনা) সুরক্ষিত অবস্থায় বের করে তার সামনে দিলেন, যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করার জন্য।

'বাইতুল্লাহ' নির্মিত হবার পর মহান আল্রাহ হযরত ইব্রাহিমকে (আ:) বলেন, এটা ইব্রাহিমী ধর্মের কেবলা ও তার সামনে মাথা নত করার প্রতীক। সুতরাং 'কাবা'কে একত্ববাদের কেন্দ্র হিসাবে সাব্যস্ত করা হল। তখন পিতা-পুত্র উভয়েই দুয়া করলেন যেন, মহান আল্লাহ তাদের ও তাদের সন্তানদের নামায কায়েম করা ও যাকাৎ আদায় করার হেদায়েৎ দান করেন। তারই ধারাবাহিকতায় হেদায়েৎপ্রাপ্ত

দল সমস্ত পৃথিবী থেকে ‘বায়তুল্লাহ’তে একত্রিত হয়ে হজ্জ করে, পরকালের সুসংবাদের আশায় তাদের জীবনকে ধন্য করেন।

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَٰلَمِينَ (96) فِيهِ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ

"নিসন্দেহে মানুষের জন্য সর্বপ্রথম যে ইবাদাত গৃহটি নির্মিত হয় সেটি মক্কায় অবস্থিত। তাকে কল্যাণ ও বরকত দান করা হয়েছিল এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য হিদায়াতের কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছিল৷ তার মধ্যে রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এবং মাকামে ইব্রাহীম। আর তার অবস্থা হচ্ছে এই যে, যে তার মধ্যে প্রবেশ করেছে, সে নিরাপত্তা লাভ করেছে৷

মানুষের মধ্য থেকে যারা সেখানে পৌঁছার সামর্থ রাখে, তারা যেন এই গৃহের হজ্জ সম্পন্ন করে, এটি তাদের ওপর আল্লাহর অধিকার। আর যে ব্যক্তি এ নির্দেশ মেনে চলতে অস্বীকার করে তার জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ বিশ্ববাসীর মুখাপেক্ষী নন৷" (সূরা আলে ইমরান-৯৬-৯৭)

সাফা-মারওয়ার ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও শিক্ষা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡبَيۡتَ أَوِ ٱعۡتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَاۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

"নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে অন্যতম। সুতরাং তোমাদের যে হজ্জ কিবা ওমরা করবে, তার কোন অপরাধ নেই এতদোভয়ের মাঝে তাওয়াফ করতে। নিশ্চয়ই যে স্বেচ্ছায় কল্যাণ কাজ করবে সে আল্লাহকে কৃতজ্ঞ এবং জ্ঞানী হিসেবে পাবে।" (সূরা আল-বাকারাহ-১৫৮)

আল্লাহ তাআলার নির্দশনসমূহের মধ্যে সাফা-মারওয়া পাহাড় দুটিও অন্যতম। যা মসজিদে হারামের নিকটে অবস্থিত। আল্লাহ তাআলা হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে হজের যে সকল আনুষ্ঠানিকতা শিখিয়েছিলেন, তার মধ্যে সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাঈ করা বা দৌড়ানোও ছিল অন্যতম। সাফা মারওয়াকে হজের রোকন করার রয়েছে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য ও শিক্ষা। যা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো-সাফা ও মারওয়ায় তাওয়াফের কারণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত হাজেরা এ পাহাড় দুটিতে সাত বার প্রদক্ষিণ করেছিলেন।

হজ্জ ও ওমরা পালনকারীদের জন্য সাফা-মারওয়া পাহাড়ে দৌড়ানো; হজরত হাজেরার দৌড়ানোই ছিল মূল উৎস। হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যখন হজরত হাজেরা ও তাঁর শিশুপুত্রকে খাদ্য-সামগ্রীবিহীন ও জন-মানবহীন মরু অঞ্চলে রেখে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের সাথে আনা খাদ্য-সামগ্রী শেষ হয়ে যায়। তখন খাদ্যাভাবে হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের প্রাণ ওষ্ঠাগত। হজরত হাজেরা অত্যন্ত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে জন-মানবহীন মরু অঞ্চলের এ পবিত্র পাহাড় দুটির মাঝে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করেন। এক পর্যায়ে মধ্যবর্তী স্থানে স্বীয় আঁচল ছড়িয়ে দিয়ে শুধুমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। অবশেষ মহান আল্লাহ তাআলা হজরত হাজেরার দুঃখ, কষ্ট, চিন্তা, দুর্ভাবনা দূর করে দিয়েছিলেন। জন-মানবহীন অঞ্চলকে মানুষের জন্য আবাসযোগ্য করেছেন। খাদ্য ও পাণীয় দিয়ে তাদের সাহায্য করেছেন। বিশ্ববাসীর জন্য শ্রেষ্ঠ ইবাদাতের স্থান নির্বাচন করেছেন। যা ছিল মহান আল্লাহ তাআলার অপার রহমত ও করুণা।

হজরত হাজেরার প্রার্থনার এ শিক্ষাকেই আল্লাহ তাআলা সারা দুনিয়ার মুসলমানদের মাঝে ছড়িয়ে দিতেই হজের আনুষ্ঠানিকতায় সাফা-মারওয়া পাহাড়ে সাঈকে আবশ্যক করে দিয়েছেন। আর তাঁর নিকট কাকুতি-মিনতির সঙ্গে দোয়া করার, তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার শিক্ষাই হলো সাফা-মারওয়ার মূল তাৎপর্য। এ পবিত্র পাহাড় দুটি তাওয়াফের সময় সমগ্র বিশ্ব থেকে আগত সকল

দর্শনার্থী, হজ্জ ও ওমরা পালনকারীর উচিত, তারা যেন অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে সাফা-মারওয়ায় সাঈ করে। মহান আল্লাহ তাআলার নিকট নিজেদের অভাব-অনটন, প্রয়োজন এবং অসহায়তার কথা পেশ করেন। মনের সকল জটিলতা-কুটিলতা থেকে মুক্ত হয়ে সুপথ প্রাপ্তির প্রার্থনা জানান। জীবনের সকল পাপ মোচনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। হজরত হাজেরার স্মৃতি বিজড়িত সাফা-মারওয়ার কার্যাবলীর তাৎপর্য হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করা এবং পালন করা মুসলিম উম্মাহর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তাদের কর্তব্য হলো- সাফা-মারওয়ার জিয়ারাতকারী যেন স্থিরতা, পুণ্য, মুক্তি এবং মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন। আল্লাহ তাআলা যেন তাঁদেরকে অন্যায় ও পাপাচারের সংকীর্ণতার পথ থেকে সরিয়ে উৎকর্ষতা, ক্ষমা এবং পুণ্যের কাজের তাওফিক প্রদান করেন। যেভাবে হজরত হাজেরাকে তিনি বিপদমুক্ত করে সাহায্য করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে সাফা-মারওয়ার ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও শিক্ষা গ্রহণ করার তাওফিক দান করুন। যে কাজে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হয়ে হজরত হাজেরাকে সকল প্রকার বিপদাপদ থেকে মুক্ত করেছিলেন; সাফা-মারওয়ায় সকল মুসলমানকে তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করার তাওফিক দান করেন।

ইবরাহীম(আঃ) এর প্রায় ২০০ বছরের পুরা জীবনটাই ছিল পরীক্ষার জীবন।সর্বাবস্থায় তিনি ছিলেন মহান আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রশক্তির বিরোধিতা তাঁকে তাঁর বিশ্বাস থেকে একচুল টলাতে পারেনি। ফলে তিনি পান মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে "বিশ্বনেতা'র দূর্লভ সম্মান।

মুসলিম উম্মাহর জাতির পিতা ও ইসলামের একজন কালজয়ী নবী ও রাসূল এর নাম হযরত ইব্রাহিম (আঃ)। ইসলামের ইতিহাসে, ইসলামের শিক্ষায়, ইসলামী জীবনীতে আমাদের হযরত ইব্রাহিম (আ:) সম্পর্কে আরো অনেক কিছুই জানার আছে। আল্লাহ আমাদের মুসলিম উম্মাহর প্রতি রহম করুন। ইব্রাহিম (আঃ) এর জীবন ও কর্ম আরো ভালোভাবে জেনে আমাদের ঈমানকে আরো মজবুত করার তাওফীক দান করুন।

Notes: